# অধ্যায় ৫

# মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া
## Human Physiology : Respiration & Breathing



**প্রধান শব্দাবলি (Key words)**

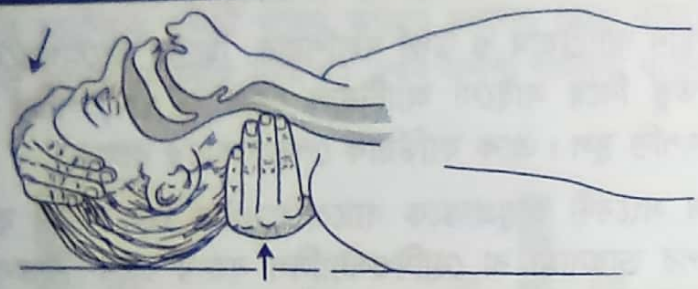

- অ্যালভিওলাই
- প্লুরা
- শ্বাসরঞ্জক
- ওটিটিস মিডিয়া
- সাইনুসাইটিস
- কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস

অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহেও বায়ুর সাথে অক্সিজেন শ্বসন অঙ্গে প্রবেশ করে এবং তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের সব অঙ্গের টিস্যুকোষে পৌঁছায়। এ অক্সিজেন টিস্যুকোষে সঞ্চিত খাদ্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনকে সচল রাখে। উপজাত হিসেবে তৈরি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি। এটিও রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে শ্বসন অঙ্গের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন দ্বারা কোষমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুকে জারিত করে খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিরূপে মুক্ত করে এবং উপজাত পদার্থ হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে তাকে **শ্বসন** বলে। এ অধ্যায়ে শ্বসন প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উর্ধ্ব শ্বসন নালি (বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল) →
১. নাসিকা (nostril)
২. নাসাগলবিল (nasopharynx)
৩. স্বরযন্ত্র (larynx)

নিম্ন শ্বসন নালি (বায়ু পরিবহন অঞ্চল) →
৪. শ্বাসনালি (trachea)
৫. ব্রঙ্কি (bronchi)
৬. প্রান্তীয় ব্রঙ্কিউল (terminal bronchioles)

ফুসফুস (শ্বসন অঞ্চল) →
৭. শ্বসন ব্রঙ্কিউল (respiratory bronchioles)
৮. অ্যালভিওলার নালি (alveolar duct)
৯. অ্যাট্রিয়াম (atrium)
১০. অ্যালভিওলার থলি (alveolar sac)
১১. অ্যালভিওলাস (alveolus)

কাজ
য়ী স্লাইড পর্যবেক্ষ
নিয়ন্ত্রণ
ইঅক্সাইড পরিবহ
ও প্রতিকার
টিস মিডিয়া
তুলনা

৮. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা হিসেবে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। | ○ মুখ হতে মুখের সাহায্যে

## মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Human Respiratory System)

মানুষের শ্বসন অঙ্গ হচ্ছে একজোড়া **ফুসফুস** (lungs)। যে পথ দিয়ে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে তা বহির্গত হয় তাকে **শ্বসন পথ** (respiratory passage) বলে। সম্মুখ নাসারন্ধ্র থেকে শ্বসন পথের শুরু। মানুষের শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে নিচে বর্ণিত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়।

### ক. বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল

**১. সম্মুখ নাসারন্ধ্র** (Anterior nostrils): নাকের সামনে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি ছিদ্রকে সম্মুখ নাসারন্ধ্র বলে। নাক একটি হলেও ন্যাসাল সেপ্টামের মাধ্যমে দুটি নাসারন্ধ্রের বিকাশ ঘটেছে। সম্মুখ নাসারন্ধ্র সবসময় উন্মুক্ত থাকে এবং এ পথেই বায়ু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

২. **ভেস্টিবিউল** (Vestibule) : নাসারন্ধ্রের পরে নাকের ভিতরের অংশের নাম ভেস্টিবিউল। এর প্রাচীরে অনেক লোম থাকে। লোমগুলো ছাঁকনির মত বাতাস পরিষ্কারে সহায়তা করে।

৩. **নাসাগহ্বর** (Nasal cavity) : ভেস্টিবিউলের পরের অংশটি নাসাগহ্বর। নাসাগহ্বরের প্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস ক্ষরণকারী ও অলফ্যাক্টরী কোষ থাকে। এটি আগত প্রশ্বাস বায়ুকে কিছুটা সিক্ত করে। সিলিয়াযুক্ত ও মিউকাস কোষগুলো ধুলাবালি এবং রোগজীবাণু আটকে দেয়। অলফ্যাক্টরী কোষ ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণে সাহায্য করে।

৪. **পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র** (Posterior nostrils) : নাসা গহ্বরদ্বয় যে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় তাকে **কোয়ানি** (choanae) বা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র বলে। এসব ছিদ্রপথে বাতাস নাসাগলবিলে প্রবেশ করে।

৫. **নাসাগলবিল** (Nasopharyx) : পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের পরে নাসাগলবিল অবস্থিত। এর পরেই **মুখ-গলবিল** (oropharynx), যা স্বরযন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

৬. **স্বরযন্ত্র** (Larynx) : নাসাগলবিলের নিচের অংশের ঠিক সামনের দিকে থাকে স্বরযন্ত্র। এটি কয়েকটি তরুণাস্থি টুকরায় গঠিত। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড তরুণাস্থি সবচেয়ে বড় এবং এটি গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে (পুরুষে)। হাত দিলে এর অবস্থান বুঝা যায় এবং বাইরে থেকে দেখা যায়। একে Adam's Apple বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে থাকে একটি ছোট **এপিগ্লটিস** (epiglottis)। স্বরযন্ত্রে অনেক পেশি যুক্ত থাকে। এর অভ্যন্তরভাগে থাকে মিউকাস আবরণী ও **স্বররজ্জু** (vocal cord)। পেশির সংকোচন-প্রসারণই স্বররজ্জুর টান (tension) বা শ্লথন (relaxation) নিয়ন্ত্রণ করে। টানটান অবস্থায় বাতাসের সাহায্যে স্বররজ্জু কম্পিত হয়ে **শব্দ** সৃষ্টি করে। এপিগ্লটিস খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখটি বন্ধ করে দেয়। ফলে খাদ্য স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না। স্বরযন্ত্রে **স্বর** সৃষ্টি হয়।

Vocal cord/স্বরযন্ত্রের তরুনাস্থি:
A → Aritinoid
C → Cricoid
T → Thyroid
E → Epiglottis
} larynx এর তরুণাস্থিসমূহ

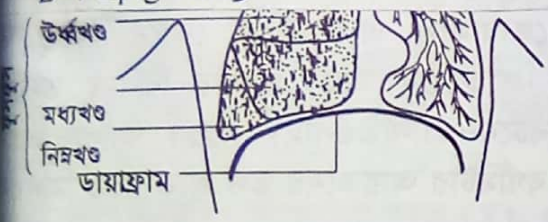


চিত্র ৫.১ : মানবদেহে শ্বসনতন্ত্রের অবস্থান

## খ. বায়ু পরিবহন অঞ্চল

৭. **শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া** (Trachea) : স্বরথলির পর থেকে পঞ্চম বক্ষদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ১২ সেমি দীর্ঘ ও ২ সেমি ব্যাসবিশিষ্ট ফাঁপা নলাকার অংশটিকে ট্রাকিয়া বলে। এটি ১৬-২০টি তরুণাস্থি নির্মিত অর্ধবলয়ে (C-আকৃতির) গঠিত। তন্তুময় টিস্যু দিয়ে অর্ধবলয়গুলো আটকানো থাকে। ট্রাকিয়ার অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস আবরণী রয়েছে। ট্রাকিয়া চুপসে যায় না বলে সহজে এর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে। এর অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়া অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রবেশ রোধ করে।

৮. **ব্রঙ্কাস** (Bronchus) : বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্ত দুটি (ডান ও বাম) শাখায় বিভক্ত হয়; এদের নাম **ব্রঙ্কাই** (bronchii-বহুবচন)। ডান ব্রঙ্কাসটি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু প্রশস্ত এবং তিনভাগে ভাগ হয়ে ডান ফুসফুসের তিনটি খণ্ডে প্রবেশ করে। বাম ব্রঙ্কাসটি দুভাগে ভাগ হয়ে বাম ফুসফুসের দুটি খন্ডে প্রবেশ করে। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্রঙ্কাস পুনঃপুনঃ বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকায় **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) গঠন করে। ব্রঙ্কিওল দুধরনের - **প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল** ও **শ্বসন ব্রঙ্কিওল**।

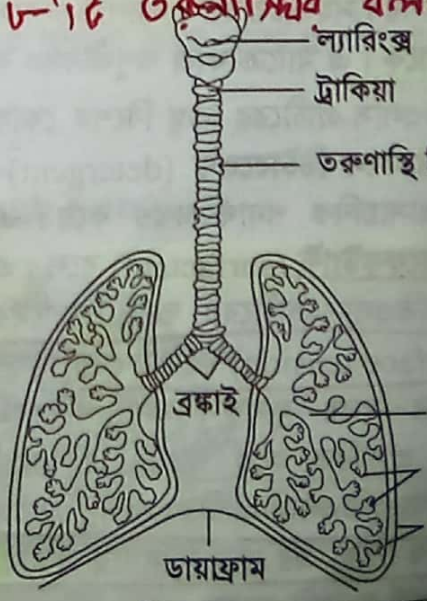


চিত্র ৫.২ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র

## গ. শ্বসন অঞ্চল

৯. **ফুসফুস** (Lungs) : বক্ষগহ্বরের দুপাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত। **প্লুরা** (plura) নামক দ্বিস্তরী একটি পাতলা আবরণে ফুসফুসদুটি আবৃত থাকে। বাইরের স্তরকে **প্যারাইটাল** (parietal) এবং ভিতরের স্তরকে **ভিসেরাল** (visceral) বলে। স্তরদুটির মাঝে অবস্থিত **সেরাস ফ্লুইড** (serous fluid) নামক তরল পদার্থ ফুসফুসকে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।

ডান দিকের ফুসফুস তিনটি **লোব** (lobe) বা খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু বাম ফুসফুসে দুটি লোব আছে। প্রতিটি লোব আবার **লোবিউল** (lobules) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। ডান ফুসফুসে ১০টি এবং বাম ফুসফুসে ৮টি লোবিউল থাকে।

চারটি প্রভাবক শ্বসন গ্যাস বিনিময়কে প্রভাবিত করে, যেমন-

- শ্বসনক্ষেত্রের আয়তন, পুরুত্ব, ও গঠন।
- অ্যালভিওলাসে $O_2$ ও $CO_2$-এর চাপ।
- $O_2$ ও $CO_2$-এর দ্রাবণ ও ব্যাপন ক্ষমতা এবং
- অ্যালভিওলাস ও রক্তে বিদ্যমান গ্যাসের শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক।

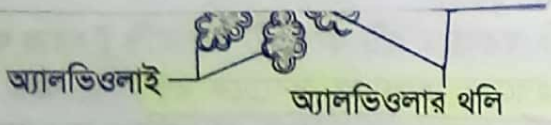


চিত্র ৫.৩ : ফুসফুসের অংশবিশেষ বিবর্ধিত

ব্রঙ্কিওলের অতিসূক্ষ্ম ও তরুণাস্থিবিহীন প্রান্তভাগকে **অ্যালভিওলার নালি** (alveolar duct) বলে। প্রতিটি নালি একেকটি **অ্যালভিওলার থলি** (alveolar sac)-তে উন্মুক্ত হয়। প্রতিটি অ্যালভিওলার থলি কতকগুলো **অ্যালভিওলাই** (alveoli;একবচনে-alveolus) নিয়ে গঠিত। অ্যালভিওলাই প্রাচীর একস্তর চাপা আবরণী কোষে গঠিত। এর চারপাশে পালমোনারি ধমনি ও শিরার কৈশিকজালিকা। অ্যালভিওলাই প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় রক্ত ও ফুসফুসের মধ্যে সহজে গ্যাসীয় পদার্থের অতি সহজে ব্যাপন ঘটে।

**অ্যালভিওলাসের গঠন** (Structure of Alveolus)

চ্যাপ্টাকৃতির স্কোয়ামাস এপিথেলিয় কোষে গঠিত কৈশিকজালিকাসমৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের মতো গ্যাসীয় বিনিময় অঙ্গ **অ্যালভিওলাস** (বহুবচনে-অ্যালভিওলাই) বলে। অ্যালভিওলাস ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যগত একক। মানুষের ফুসফুসে প্রায় ৭০-৯০ বর্গমিটার আয়তনের তল জুড়ে ৭০০ মিলিয়ন (৭০ কোটি)-এরও বেশি সংখ্যক অ্যালভিওলাই রয়েছে।

প্রত্যেক অ্যালভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, মাত্র ০.১μm পুরু। এর বহির্দেশ ঘন কৈশিকজালিকা-সমৃদ্ধ। কৈশিকজালিকাগুলো পালমোনারি ধমনি থেকে সৃষ্টি হয় পরে পুনর্মিলিত হয়ে পালমোনারি শিরা গঠন করে। প্রাচীর আর্দ্র স্কোয়ামাস (আঁইশাকার) এপিথেলিয়াম নির্মিত। এতে কোলাজেন ও ইলাস্টিন তন্তুও রয়েছে। ফলে শ্বসনের সময় সংকোচন-প্রসারণ সহজতর হয়। অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে ফ্যাগোসাইটিক **অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফাজ** (macrophage W.B.C.) থাকে। এ ম্যাক্রোফাজ অণুজীবসহ বহিরাগত বস্তু বিনষ্ট কর দেয়।

অ্যালভিওলাস-প্রাচীরের কিছু বিশেষ কোষ প্রাচীরের অন্তঃতলে **ডিটারজেন্ট** (detergent)-এর মতো রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। এ পদার্থকে **সারফেকট্যান্ট** (surfactant) বলে। এ পদার্থ অ্যালভিওলাস-প্রাচীরের তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান (surface tension) কমিয়ে দেয়, ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস কম পরিশ্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। এ পদার্থ বাতাস ও অ্যালভিওলাস-প্রাচীর সংলগ্ন তরল পদার্থে $O_2$ ও $CO_2$-এর দ্রুত বিনিময়ে সাহায্য করে। এ পদার্থ অ্যালভিওলাসে আগত জীবাণুও (ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করে। ২৩ সপ্তাহ বয়স্ক মানবভ্রূণে সর্বপ্রথম সারফেকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয়। এ কারণে ২৪ সপ্তাহের আগে মানবভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না। অনেক দেশে তাই এ সময়কাল পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেয়া হয়।

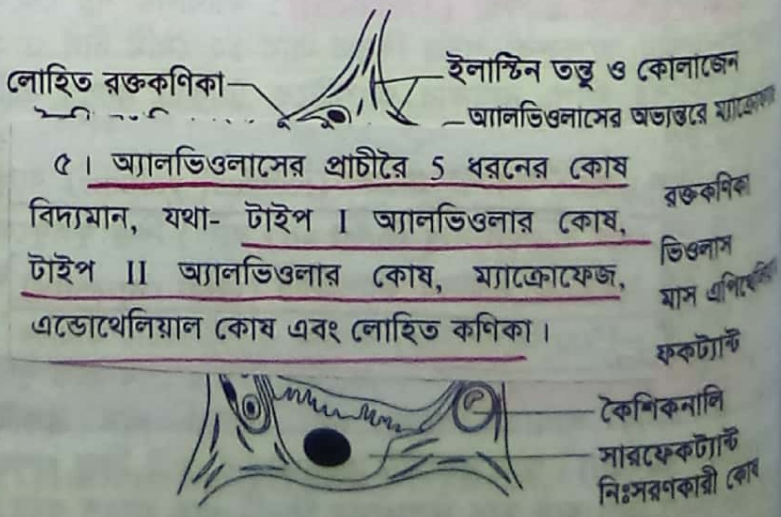


৫। অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে 5 ধরনের কোষ বিদ্যমান, যথা- টাইপ I অ্যালভিওলার কোষ, টাইপ II অ্যালভিওলার কোষ, ম্যাক্রোফেজ, এন্ডোথেলিয়াল কোষ এবং লোহিত কণিকা।

চিত্র ৫.৪ : অ্যালভিওলাসের গঠন

**ফুলকা (মাছের) এবং ফুসফুসের (মানুষের) মধ্যে পার্থক্য**

| ফুলকা | ফুসফুস |
|---|---|
| ১. মাছসহ বহু জলচর প্রাণীর শ্বসন অঙ্গ। | প্রধানত স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্বসন অঙ্গ। |
| ২. ফুলকাগুলো চাপা ও খন্ডিত। | ফুসফুস দেখতে বেলুনের মতো। |
| ৩. নির্দিষ্ট ফুলকা প্রকোষ্ঠে নিহিত থাকে। | বক্ষ গহ্বরে অবস্থান করে। |
| ৪. প্রতিটি ফুলকা দুসারি ফুলকাসূত্রক দিয়ে গঠিত এবং প্রচুর রক্তজালকসমৃদ্ধ। | প্রতিটি ফুসফুস অসংখ্য বুদবুদের মতো অ্যালভিওলাই নিয়ে গঠিত। প্রতিটি অ্যালভিওলাসের প্রাচীর কৈশিকনালিসমৃদ্ধ। |
| ৫. রক্তজালকসমৃদ্ধ হওয়ায় সহজেই পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। | অ্যালভিওলাইয়ের কৈশিকনালির মাধ্যমে বায়ু থেকে গৃহীত অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে। |

**শ্বসনতন্ত্রের কাজ**

১. **শ্বসন গ্যাসের বিনিময় :** শ্বাসক্রিয়ার সময় পরিবেশের $O_2$ রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে $CO_2$ পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়।

২. **শক্তি উৎপাদন :** শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত $O_2$ কোষীয় শ্বসনে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

৩. **পানি সাম্য :** নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০০–৬০০ মিলিলিটার পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এতে দেহের পানি সাম্য বজায় রাখতে সুবিধা হয়।

৪. **তাপ নিয়ন্ত্রণ :** নিঃশ্বাসের সময় $CO_2$ এর সাথে দেহের কিছু তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপমাত্রা বজায় থাকে।

৫. **এসিড ও ক্ষারের সাম্যতা :** নিঃশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হওয়ায় $p^H$ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা হয়।

৬. **শব্দ উৎপন্ন :** ল্যারিংক্সের মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন করে।

৭. **হোমিওস্ট্যাসিস :** দেহাভ্যন্তরের গোমিওস্ট্যাটিস রক্ষা করে।

৮. **উদ্বায়ী গ্যাস :** দেহ থেকে কিছু উদ্বায়ী গ্যাস, যেমন-ক্লোরোফর্ম, ইথার, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিষ্কাশন করে।

৯. **দূষিত পদার্থের প্রবেশ রোধ :** শ্বসনতন্ত্র বাতাসে বিদ্যমান জীবাণু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ প্রবেশ রোধ করে।

## ব্যবহারিক

### ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (Section through Lung)

**শনাক্তকরণ**

১. অনুচ্ছেদের অভ্যন্তরভাগ বুদবুদ-এর মতো অসংখ্য **অ্যালভিওলাই** (alveoli)-এ বিভক্ত।

২. অ্যালভিওলাই **ট্রাবেকুলি** (trabeculae) নামক ব্যবধায়ক পর্দার মাধ্যমে পৃথক।

৩. অসংখ্য সূক্ষ্ম সিলিয়াযুক্ত বায়ু নালিকা বা **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) দেখা যায়।

৪. অ্যালভিওলাই ও ব্রঙ্কিওলের ফাঁকে ফাঁকে **রক্তনালি** অবস্থিত।

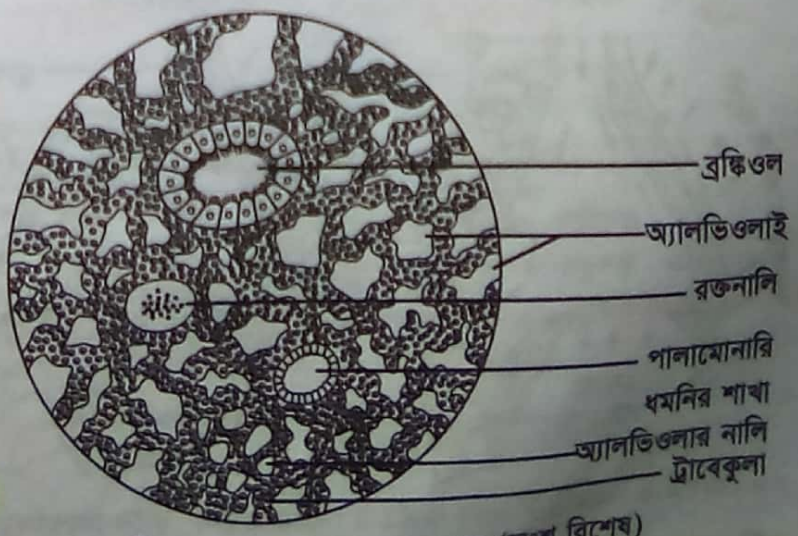


চিত্র ৫.৫ : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (অংশ বিশেষ)

## শ্বসনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Respiration)

পরিবেশ থেকে গৃহীত $O_2$ দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্য (গ্লুকোজ) জারিত করে শক্তি উৎপাদন শেষে $CO_2$ পরি ফিরিয়ে দেয়ার জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম **শ্বসন**। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া ও মানবদেহে নিরন্তর চলমান প্র নিচে বর্ণিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়।

**১. বহিঃশ্বসন** (External respiration) : এটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা ফুসফুসে সংঘটিত হয়। এ প্র এনজাইমের কোন ভূমিকা নেই এবং কোন শক্তিও উৎপন্ন হয় না। ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে প্রশ্বাসের মাধ্যমে $O_2$ এবং দেহকোষ থেকে উৎপন্ন এবং রক্তবাহিত $CO_2$ গ্যাসের বিনিময় ঘটে।

**২. অন্তঃশ্বসন** (Internal respiration) : এটি জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া যা দেহকোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়। এ এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। ফুসফুস কর্তৃক বায়ুমণ্ডল থেকে গৃহীত $O_2$ র বাহিত হয়ে দেহকোষে পৌঁছায় যেখানে গ্লুকোজ জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। উপজাত বস্তু হিসেবে নির্গত $CO_2$ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়।

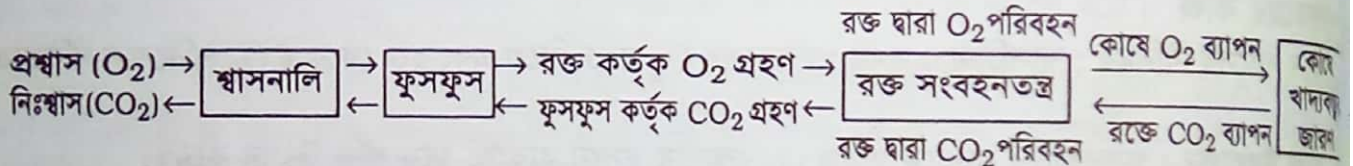


নিচে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম এবং গ্যাসীয় পরিবহন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো।

## প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (Ventilation Mechanism)

যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে হয়ে যায় তাকে **শ্বাসক্রিয়া** (breathing) বলে। প্রকৃতপক্ষে এটি বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়া। বক্ষগহ্বরের আয়তন হ্রাস-ফলে ফুসফুসের আয়তন সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দুধরনের পেশির ক্রিয়ায় বক্ষগ আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে : (১) বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে অবস্থিত **ডায়াফ্রাম** (diaphragm) এবং (২) পর্শুকা (ribs) ফাঁকে অবস্থিত **ইন্টারকোস্টাল পেশি** (intercostal muscle)। শ্বাসক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা **প্রশ্বাস** বা শ্বাসগ্রহণ এবং (খ) **নিঃশ্বাস** বা শ্বাসত্যাগ।

**ক. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ** (Inhalation) : ডায়াফ্রাম-পেশি সংকুচিত হলে এর কেন্দ্রীয় **টেনডন** (tendon) নি সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষগহ্বরের অনুদৈর্ঘ্য ব্যাস বেড়ে যায়। একই সময় নিম্নভাগের **পর্শুকাগুলো** (ribs) কিছুটা উঠে আসায় বক্ষগহ্বরের পার্শ্বীয় এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসও বেড়ে যায়। **ইন্টারকোস্টাল** (intercostal) পেশির সংকো ফলে পর্শুকার শ্যাফট (shaft) উ হয়। এতে স্টার্ণাম উপরে সামনে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষের পশ্চাৎ ব্যাসসহ অনুপ্রস্থ ব্যাস বৃদ্ধি পায়।

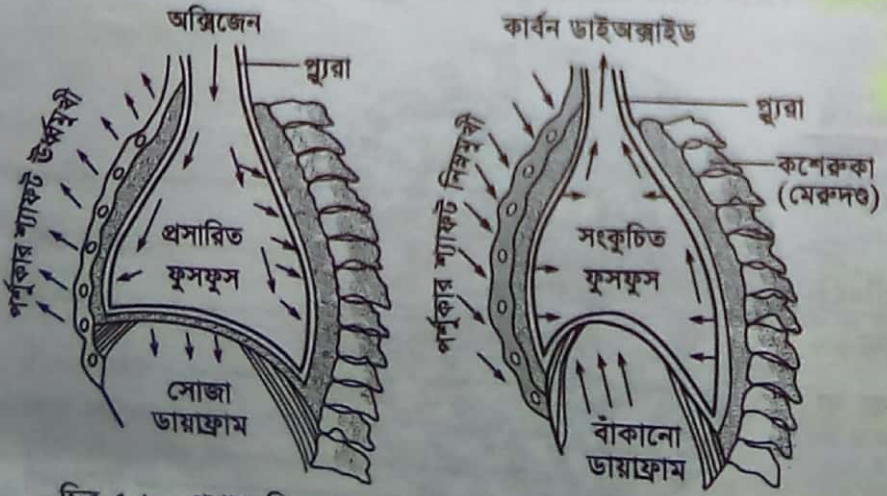


চিত্র ৫.৬ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (বায়ে-প্রশ্বাস; ডানে-নিঃশ্বাস)

এভাবে ডায়াফ্রাম ও পর্শুকা সংকোচনের ফলে বক্ষীয় গহ্বর বেড়ে যায়। এ কারণে ফুসফুস প্রসারি এর ভিতরের আয়তনও বাড়িয়ে প্রসারিত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ চাপ বা সাধারণ চাপ অপেক্ষা কম হওয়ায় পথের ভিতর দিয়ে আসা বাতাস ফু প্রবেশ করে।

**পরিবেশ থেকে $O_2$—সমৃদ্ধ বায়ু নাসারন্ধ্র পথে ট্রাকিয়া → ব্রঙ্কাস → ব্রঙ্কিওল → অ্যালভিওলাই তথা ফুসফুসে**

**খ. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ** (Exhalation) : এটি প্রশ্বাসের পর পরই সংঘটিত একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। অংশগ্রহণকারী পেশিগুলোর প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য নিঃশ্বাস ঘটে।

নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পাঁজরকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়; উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়; ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; এবং প্লুরার অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকা পথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

**ফুসফুসে $CO_2$-সমৃদ্ধ বায়ু → অ্যালভিওলাই→বঙ্কিওল → ব্রঙ্কাস → গ্লটিস → নাসাপথ → নাসারন্ধ্র পথে বাইরে নিষ্কাশন।**

শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষে বিশ্রামকালে এ প্রক্রিয়া প্রতিমিনিটে ১৪–১৮ বার এবং নবজাত শিশুতে ৪০ বার সংঘটিত হয়। তবে ব্যায়াম বা অন্য কারণে শ্বসনের হার দ্রুত হয় বলে উদরীয় পেশিও তখন শ্বসন কাজে যোগ দেয়।

## প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Ventilation Control)

স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা তেমন ভাবি না। পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মেডুলায় শ্বসনের এ কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রের নিচের অংশটি (অংকীয়) **প্রশ্বাস কেন্দ্র**। এটি প্রশ্বাসের হার ও গভীরতা বাড়ায়। এ কেন্দ্রের পৃষ্ঠীয় পার্শ্বদেশ প্রশ্বাস বন্ধ করে নিঃশ্বাস ত্বরান্বিত করে। এ অংশগুলো **নিঃশ্বাস কেন্দ্র**। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কেন্দ্র ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুর সাহায্যে ইন্টারকোস্টাল পেশির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। ব্রঙ্কিওল ও ব্রঙ্কাই মস্তিষ্কের সঙ্গে ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে যুক্ত। ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশিতে প্রেরিত ছন্দময় স্নায়ু-উদ্দীপনার ফলে এসব অংশে শ্বসনিক আন্দোলন সংঘটিত হয়।

প্রশ্বাসের কারণে ফুসফুস ফুলে উঠে, ব্রঙ্কিওলে অবস্থিত রিসেপ্টরগুলো সটান হয়, ফলে তা উদ্দীপ্ত হয়ে ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে আরও বেশি স্নায়ু উদ্দীপনা নিঃশ্বাস কেন্দ্রে প্রেরণ করে। তখন প্রশ্বাস কেন্দ্র ও প্রশ্বাস সাময়িক বন্ধ থাকে। অন্তঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি তখন শিথিল হয়, ফুসফুসের টিস্যু চুপসে যায়, ফলে নিঃশ্বাস ঘটে। এরপর ব্রঙ্কিওলগুলো সটান থাকে না, রিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত থাকে না। প্রশ্বাস কেন্দ্র তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং আবার প্রশ্বাস শুরু হয়। এভাবে সম্পূর্ণ চক্রটি আজীবন ছন্দায়িত পুনরাবৃত্ত হয়।

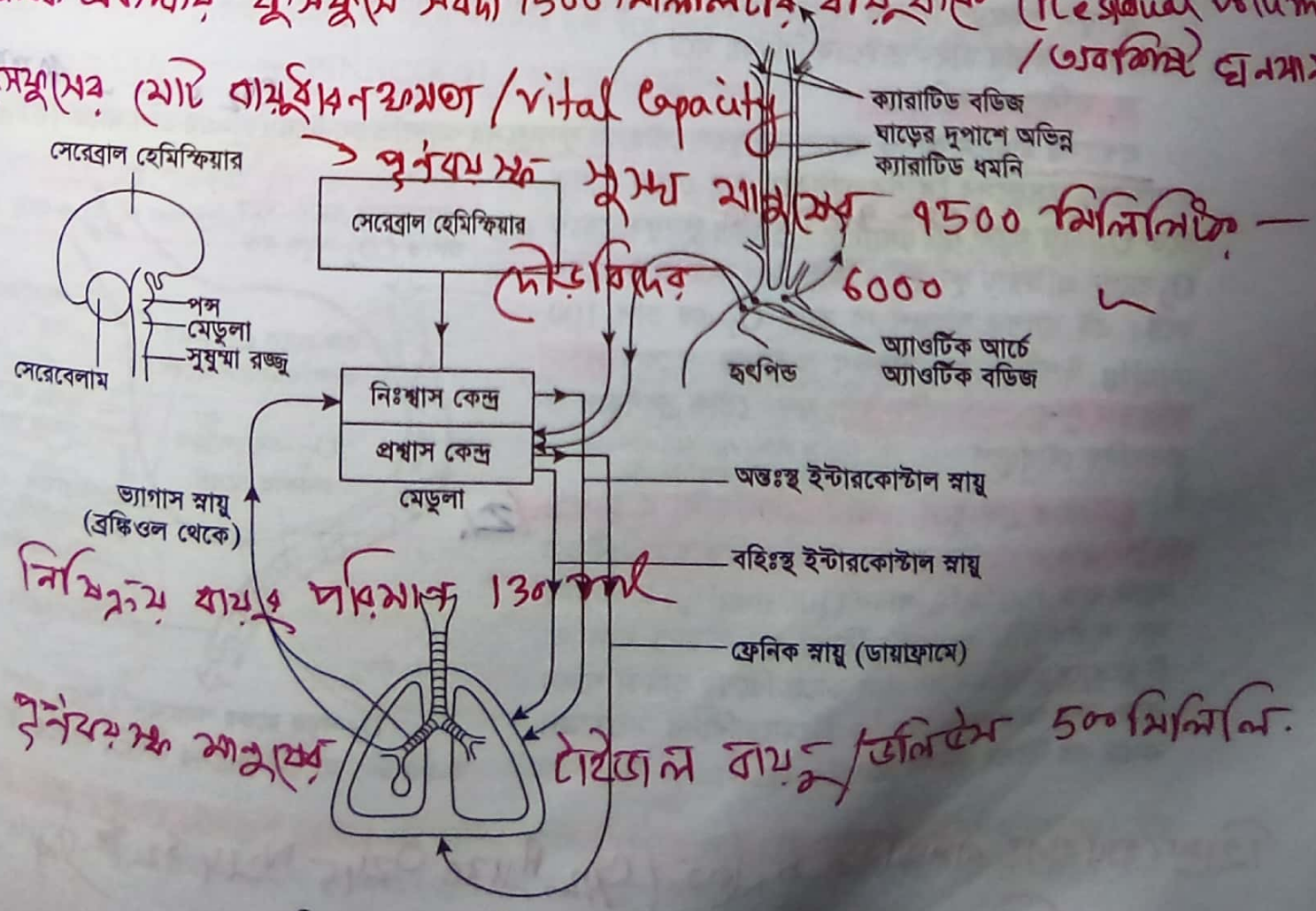


চিত্র ৫.৭ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ

শ্বসনের মৌলিক ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে মেডুলা। এখানে সরবরাহকৃত সমস্ত স্নায়ু কেটে ফেললেও ছন্দ অব্যাহত থা তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন উদ্দীপনা এ মৌলিক ছন্দের হেরফের ঘটাতে পারে। প্রধান যে উদ্দীপনা প্রশ্বাস-নিঃশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে তা হচ্ছে রক্তে $O_2$ এর চেয়ে $CO_2$ এর ঘনত্ব। $CO_2$-এর লেভেল বেড়ে গেলে (যেমন–ব্যায়ামের স রক্ত-সংবহনতন্ত্রের **ক্যারোটিড** ও **অ্যাওর্টিক বডিজ** (carotid and aortic bodies)-এ অবস্থিত কেমোরিসেপ্টর উ হয়ে প্রশ্বাস কেন্দ্রে স্নায়ু-উদ্দীপনা প্রেরণ করে। প্রশ্বাস কেন্দ্র তখন বহিঃইন্টারকোস্টাল ও ফ্রেনিক স্নায়ুর ম বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশি ও ডায়াফ্রামে স্নায়ু-উদ্দীপনা প্রেরণ করে এদের সংকোচনের গতি বড়িয়ে দেয়। এতে প্রশ্ব হার বেড়ে যায়। সুযোগ পেলে $CO_2$ দেহে দ্রুত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। দেহে দ্রবীভূত হয়ে যে এসিড উৎপন্ন তা এনজাইম ও বিভিন্ন প্রোটিন বিনাশ শুরু করে। বাতাসে $CO_2$ ঘনত্ব ০.২৫% বাড়লে শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে অন্যদিকে, বাতাসে যদি $O_2$ ঘনত্ব ২০% থেকে ৫% এ নেমে আসে তাহলেও শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। $O_2$ ঘনত্বও শ্বসন হারে প্রভাব ফেলে। তবে স্বাভাবিক পরিবেশে প্রচুর $O_2$ থাকে বলে প্রভাবও পড়ে কম। $O_2$ ঘনত্বের সংবেদী কেমোরিসেপ্টরগুলো মেডুলা এবং অ্যাওর্টিক ও ক্যারোটিড বডিজে অবস্থান করে (এসব বডি $CO_2$ রিসে হিসেবেও কাজ করে)।

সীমিত মাত্রায় শ্বসনের (প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস) হার ও গভীরতাকে ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন- বাতাস ফু ভিতর টেনে নিয়ে ধরে রাখা যায়। ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ সজোর শ্বসন, বক্তৃতা করা, গান গাওয়া, হাঁচি ও কাঁশি দেওয়ার জন্য হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ একবার প্রয়োগ হয়ে গেলে মস্তিষ্কের সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা কেন্দ্রে পৌছে নির্দেশ কার্যকর করে।

সটান (stretch) রিসেপ্টর ও কেমোরিসেপ্টরের মাধ্যমে প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ একটি নেতিবাচক প্রতিফল। নেতিবাচক প্রতিফল সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় বাতিল হয়ে যেতে পারে।

## গ্যাসীয় ($O_2$ ও $CO_2$) পরিবহন (Transportation of Gases)

ফুসফুস গহ্বরের ভিতরে অ্যালভিওলাই-এর বাতাস এবং এগুলোর প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিকনালির রক্তের অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে।

### ক. অক্সিজেন পরিবহন

প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাস ফুসফুসে পৌছালে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে $O_2$-এর চাপ থাকে 107 mmHg। অন্যদিকে, ফুসফুসের কৈশিকজালিকায় দেহ থেকে আগত রক্তে $O_2$-চাপ থাকে 40 mmHg। সুতরাং ফুসফুস থেকে $O_2$ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসীয় ঝিল্লি ভেদ করে রক্তে প্রবেশ করে। এই ব্যাপন যতক্ষণ না রক্তে $O_2$-এর চাপ 100 mmHg উপনীত হয় ততক্ষণ অব্যাহত থাকে। রক্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়ঃ যথা- **ভৌত দ্রবণরূপে** ও **রাসায়নিক যৌগরূপে**।

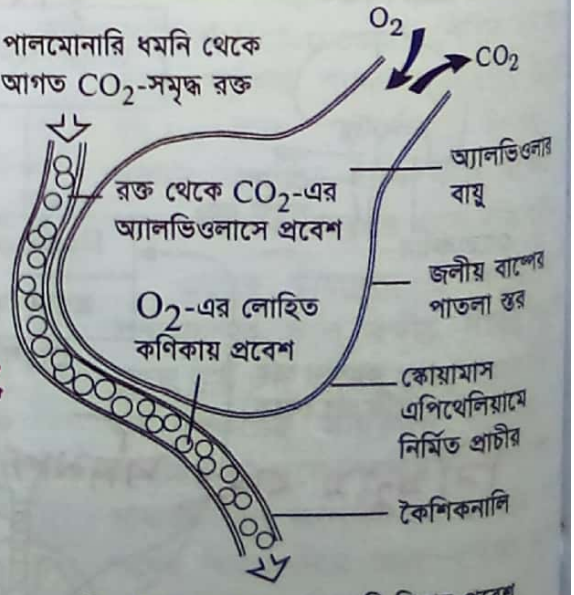

চিত্র ৫.৮ : অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময়

i. **ভৌত দ্রবণরূপে** : প্রতি 100 মি.লি. রক্তে 0.2 মি.লি. অক্সিজেন ভৌত দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয়। দ্রবীভূত অংশই রক্তে 100 মি.মি. পারদ (100 mmHg) চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী। তবে অংশের পরিমাণ খুব সামান্য বলে তা টিস্যুকোষে অক্সিজেন সরবরাহ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে না। তবে অক্সিজেন ও হিমোগ্লোবিনের সংযোজন কাজে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ii. **রাসায়নিক যৌগরূপে :** $O_2$ রক্তে প্রবেশের পর লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে **অক্সি-হিমোগ্লোবিন** গঠন করে। এটি একধরনের শিথিল রাসায়নিক যৌগ, যা অক্সিজেনের চাপ কমে গেলে পুনরায় বিযুক্ত হয়। এ সংযোজন রক্তে অক্সিজেনের দ্রবীভূত অংশের চাপের উপর নির্ভরশীল। এ চাপ যত বাড়ে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে তত বেশি সংযুক্ত হয়।

$Hb_4 + 4O_2 \rightleftharpoons 4HbO_2$ [Hb = হিমোগ্লোবিন]

## খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন

শর্করা জারণের সময় কোষে $CO_2$ সৃষ্টি হয়। এই $CO_2$ দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোষ থেকে $CO_2$ রক্তে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বায়ুতে মুক্ত হয়। নিচেবর্ণিত তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে $CO_2$ রক্তে পরিবাহিত হয়।

i. **ভৌত দ্রবণরূপে :** কিছু পরিমাণ (৫%) $CO_2$ রক্তরসের পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড গঠন করে।

$H_2O + CO_2 \longrightarrow H_2CO_3$ (কার্বনিক এসিড)

এ বিক্রিয়ায় **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** এনজাইম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

প্রতি হাজার $CO_2$ অণুর মধ্যে মাত্র এক অণু $H_2CO_3$ রূপে দ্রবণে উপস্থিত থাকে। সুতরাং $CO_2$-এর খুব সামান্য অংশই $H_2CO_3$ রূপে পরিবাহিত হয়।

ii. **কার্বোমিনো যৌগরূপে :** টিস্যুকোষ থেকে রক্তের প্লাজমায় আগত $CO_2$-এর কিছু অংশ লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। লোহিত কণিকার মধ্যে যে **হিমোগ্লোবিন থাকে তার গ্লোবিন** (প্রোটিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের-($NH_2$) সাথে $CO_2$ যুক্ত হয়ে **কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে।

$$CO_2 + HbNH_2 \longrightarrow HbN\begin{matrix} H \\ COOH \end{matrix} = HbNHCOOH \text{ (কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিন)}$$

$CO_2$-এর একাংশ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে কার্বামিনো-প্রোটিন গঠন করে।

$PrNH_2 + CO_2 \longrightarrow PrNHCOOH$ (কার্বমিনো-প্রোটিন)

এই রাসায়নিক ক্রিয়া এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

মোট $CO_2$-এর শতকরা ২৭ ভাগ কার্বামিনো যৌগরূপে পরিবাহিত হয়। প্রতি ১০০ মিলি. রক্তে এর পরিমাণ ৩ মি.লি. যার ২ মি.লি কার্বোমিনো-হিমোগ্লোবিনরূপে এবং ১ মি.লি কার্বোমিনো-প্রোটিনরূপে পরিবাহিত হয়।

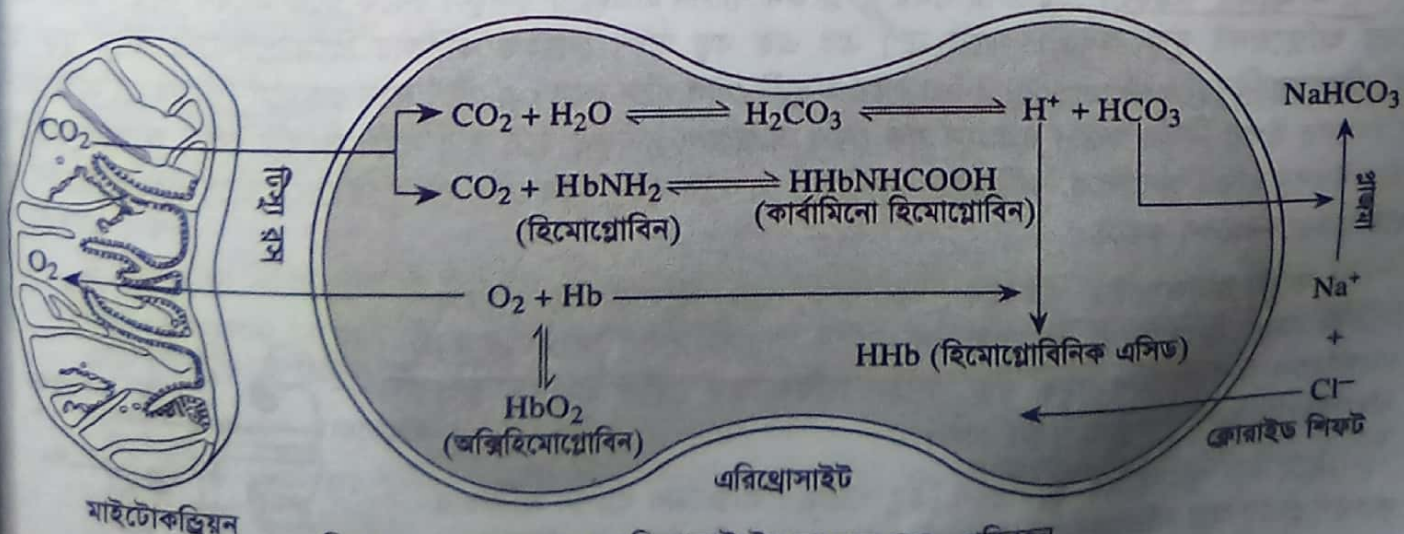




চিত্র ৫.৯ : প্লাজমা এবং এরিথ্রোসাইটের মাধ্যমে $CO_2$ পরিবহন

iii. **বাইকার্বোনেট যৌগরূপে :** $CO_2$-এর বেশির ভাগই (৬৫%) রক্তে বাইকার্বোনেটরূপে পরিবাহিত হয়। এটি-(১) $NaHCO_3$-রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং (২) $KHCO_3$-রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

টিস্যুরস থেকে $CO_2$ প্রথমে প্লাজমায় ও পরে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ (carbonic anhydrase) নামক এনজাইমের উপস্থিতিতে লোহিত কণিকার মধ্যে $CO_2$ পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড ($H_2CO_3$) উৎপন্ন করে। রক্তরসে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ অনুপস্থিত থাকায় খুব কম মাত্রায় কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3} \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

লোহিত কণিকায় উৎপন্ন $H_2CO_3$ বিশ্লিষ্ট হয়ে $H^+$ ও $HCO_3^-$ আয়নে পরিণত হয়। লোহিত কণিকায় বেশি মাত্রায় $HCO_3^-$ সঞ্চিত হওয়ায় এর ঘনত্ব প্লাজমার তুলনায় বেশি হয়।

আয়ন লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় পরিব্যাপ্ত (diffuse) হয় এবং প্লাজমার $Na^+$ আয়নের সাথে মিলে $NaHCO_3$ উৎপন্ন করে। লোহিত কণিকার মধ্যে $K^+$ আয়নের সাথে $HCO_3^-$ বিক্রিয়া করে $KHCO_3$ এ পরিণত হয়।

লোহিতকণিকা থেকে প্লাজমায় $HCO_3^-$ আয়ন আগমনের সাথে সমতা রেখে প্লাজমা থেকে $Cl^-$ লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে এবং লোহিত কণিকায় $K^+$ আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে KCl গঠন করে। লোহিত কণিকা থেকে $HCO_3^-$ আয়নের বের হয়ে আসার ফলে ঋণাত্মক আয়নের যে ঘাটতি হয় প্লাজমার ক্লোরাইড ($Cl^-$) আয়ন লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সে ঘাটতি পূরণ করে। একে **ক্লোরাইড শিফট** (chloride shift) বলে। ক্লোরাইড শিফটকে এর প্রথম বর্ণনাকারী জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ হার্টগ জ্যাকব হ্যামবার্গার (Hartog Jacob Hamburger)-এর নাম অনুসারে **হ্যামবার্গার শিফট**ও বলা হয়।

## শ্বসনে শ্বাসরঞ্জকের ভূমিকা (Role of Respiratory Pigments during Respiration)

**হিমোগ্লোবিন** হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের লোহিত কণিকায় এবং অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্লাজমায় বিস্তৃত লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী অক্সিজেনবাহী শ্বাসরঞ্জক। লোহিত রক্তকণিকার প্রধান প্রোটিন হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। এর বর্ণের জন্যই লোহিত কণিকা লাল দেখায় এবং লোহিত কণিকার সংখ্যাধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়। রক্তের লোহিত কণিকার বিস্তৃত লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী ভারী পদার্থ। এর বর্ণের জন্যই রক্ত লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস **অক্সিজেন** পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে, কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডও বহন করে। চারটি একক নিয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন একটি গোল অণু। এর প্রতিটি একক পলিপেপটাইড জাতীয় প্রোটিন গ্লোবিন (globin) এবং লৌহগঠিত হিম (heme) নিয়ে গঠিত। রক্তে হিম ও গ্লোবিন ১ ঃ ২৫ অনুপাতে উপস্থিত থাকে। হিমের ৩৩.৩৩% লৌহ (Fe)। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র ৩ গ্রাম লৌহ থাকে।

i. **অক্সিজেন পরিবহন :** শ্বসনের সময় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রবিষ্ট সমস্ত অক্সিজেনই মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এর এক বড় অংশ লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (oxyhaemoglobin) নামে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ গঠন রক্তরসে (প্লাজমায়) অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। রক্তরসে যত বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হবে তার সাথে সংগতি রেখে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ উৎপন্ন হবে। অন্যদিকে, অক্সিজেনের পরিমাণ যে হারে কমে যাবে যৌগ সে হারে ভেঙে যাবে এবং অক্সিজেন মুক্ত হয়ে রক্তরসে প্রবেশ করবে।

ii. **কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন :** অন্যদিকে, $CO_2$ হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে **কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন** নামক অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। কার্বোমিনো হিমোগ্লোবিন-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে।

চিত্র ৫.১০ : হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সংযুক্তি

দেহে রক্ত পরিবহনের সময় বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তরস থেকে স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত টিস্যুরসে চলে যায়। ফলে রক্তরসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। হিমোগ্লোবিন তখন তার সাথে যুক্ত অক্সিজেন ছড়াতে শুরু করে। এভাবে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসে ও পরে টিস্যুরসে চলে যায়।

## শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার
## (Problems, Symptoms and Remedy of Respiratory Tract)

সচল মানবদেহের জন্য সুস্থ অঙ্গতন্ত্র প্রয়োজন। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে শ্বসনতন্ত্রের **শ্বসননালি** অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এ শ্বসননালি প্রায়ই ভাইরাসে, মাঝে-মধ্যে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সচল দেহকে প্রায় আধা-অচল করে দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শ্বসননালির সংক্রমণকে দুভাগে ভাগ করে থাকেন। (১) **উর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণ** (ফলে নাক, কান, গলা, সাইনাস আক্রান্ত হয়) এবং (২) **নিম্ন শ্বসননালিতে সংক্রমণ** (ফলে শ্বাসনালি ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়)। উর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণের উদাহরণ হিসেবে সিলেবাসভুক্ত **সাইনুসাইটিস** ও **ওটিটিস মিডিয়া** সৃষ্ট সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

### সাইনুসাইটিস (Sinusitis)

মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত বায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরকে **সাইনাস** বা **প্যারান্যাসাল সাইনাস** (paranasal sinus) বলে। এগুলো হলো–

১. **ম্যাক্সিলারি সাইনাস** (Maxillary sinus) : ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে গালে অবস্থিত।
২. **ফ্রন্টাল সাইনাস** (Frontal sinus) : চোখের উপরে অবস্থিত।
৩. **এথময়েড সাইনাস** (Ethmoid sinus) : দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত।
৪. **স্ফেনয়েড সাইনাস** (Sphenoid sinus) : এথময়েড সাইনাসের পেছনে অবস্থিত।

সাইনাস সাধারণত বায়ুপূর্ণ মিউকাস পর্দায় আবৃত এবং ক্ষুদ্র নালির মাধ্যমে নাসাগহ্বর তথা শ্বাসনালির সাথে যুক্ত থাকে। এসব সাইনাস যদি বাতাসের বদলে তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে এবং এই তরল যদি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকে সংক্রমিত হয় তখন সাইনাসের মিউকাস পর্দায় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। **ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সংক্রমণে বা এলার্জিজনিত কারণে সাইনাসের মিউকাস পর্দায় যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাকেই সাইনুসাইটিস বলে।** সাইনুসাইটিসের কারণে মাথা ব্যথা, মুখমন্ডলে ব্যথা, নাক দিয়ে ঘন হলদে বা সবুজাভ তরল ঝরে পড়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

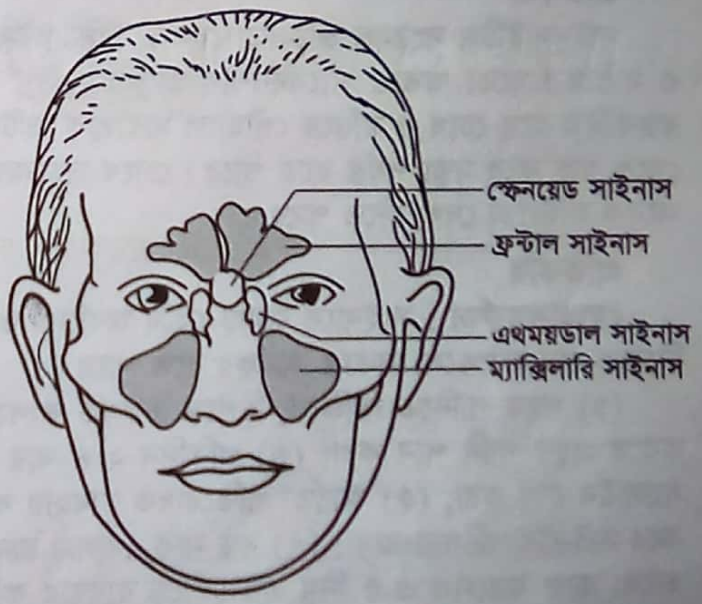

চিত্র ৫.১১ : মুখোমণ্ডলীয় অংশে চারটি সাইনাসের অবস্থান

স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সাইনুসাইটিস দুরকম :

১. **অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস** (Acute sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ৪ – ৮ সপ্তাহ।

২. **ক্রনিক সাইনুসাইটিস** (Chronic sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ২ মাসের বেশি সময়।

**রোগের কারণ**

১. সাইনাসগুলো বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস (Human respiratory syncytial virus, Parainflueza virus, Metapneumo virus), ব্যাকটেরিয়া *(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae)* এবং কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাকে আক্রান্ত হলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।

২. ঠাণ্ডাজনিত কারণে ; অ্যালার্জিজনিত কারণে; ব্যবধায়ক পর্দার অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে; নাকে **পলিপ** (polyp) সৃষ্টির কারণে; নাসাগহ্বরের মিউকোসা স্ফীতির ফলে নাসাপথ সরু হয়ে ক্রনিক সাইনুসাইটিস হতে পারে।

৩. দাঁতের ইনফেকশন থেকে বা দাঁত তুলতে গিয়েও সাইনাসে সংক্রমণ হতে পারে।

৪. যারা হাঁপানির সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিস দেখা যায়।

৫. সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট, তেলাপোকা ইত্যাদি যেসব অ্যালার্জেন ধারণ করে তার প্রভাবে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে।
৬. ইউস্টেশিয়ান নালির (eustachian tube) সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে এর সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।
৭. নাকের হাড় বাঁকা থাকলে অথবা নাকের পিছনে টনসিল বড় হলে এ রোগ হতে পারে।
৮. সিস্টিক ফাইব্রোসিস জিন-এর কারণে এ রোগ হয়।
৯. অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ ও ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের কারণেও এ রোগ হতে পারে।

**রোগের লক্ষণ**

১. নাক থেকে হলদে বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের হয়। এতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে।
২. দীর্ঘ ও বিরক্তিকর তীব্র মাথা ব্যাথা লেগেই থাকে যা সাইনাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে পারে।
৩. মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাঁটলে বা মাথা নিচু করলে ব্যথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়।
৪. জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কোন কিছু ভালো লাগে না বরং অল্পতেই ক্লান্ত লাগে।
৫. নাক বন্ধ থাকে, নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে বাজে গন্ধ বের হয়।
৬. মুখমন্ডল অনুভূতিহীন মনে হয়।
৭. মাথা ব্যথার সাথে দাঁত ব্যথাও হতে পারে।
৮. কাশি হয়, রাতে কাশির তীব্রতা বাড়ে, গলা ভেঙ্গে যায়।

**জটিলতা**

সাইনুসাইটিস সংক্রান্ত জটিলতা কেবল নাসিকাগহ্বর ঘিরেই অবস্থান করে না, বরং সাইনাসগুলোর অবস্থান চোখ ও মস্তিষ্কের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের সংলগ্ন হওয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ শুধু সাইনাসেই সীমাবদ্ধ না থেকে রক্তবাহিত হয়ে চোখ ও মস্তিষ্কে পৌছালে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে সংক্রমণের ফলে মাথাব্যথা, দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। চোখে সংক্রমণের ফলে পেরিঅরবিটাল ও অরবিটাল সেলুলাইটিসসহ আরও অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

**প্রতিকার**

**স্বেচ্ছাসতর্কতা :** সাইনাসে জমাট বেঁধে অবস্থিত তরলকে বিগলিত করে সাইনাসকে চাপমুক্ত ও স্বাভাবিক রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

(১) গরম পানিতে ভিজিয়ে, চিপড়ে একখন্ড কাপড় প্রতিদিন বারবার মুখমন্ডলে চেপে ধরা; (২) মিউকাস তরল করতে প্রচুর পানি পান করা; (৩) প্রতিদিন ২-৪ বার নাক দিয়ে বাষ্প টেনে নেওয়া; (৪) দিনে কয়েকবার ন্যাসাল স্যালাইন স্প্রে করা; (৫) আর্দ্রতা প্রতিরোধক ব্যবহার করা; (৬) যন্ত্রের সাহায্যে নাকের ভিতর স্ববেগে পানি প্রবাহিত করে সাইনাস পরিষ্কার রাখা; (৭) বন্ধ নাক খোলার জন্য ন্যাসাল স্প্রে ব্যবহারে সতর্ক থাকা [প্রথম দিকে ন্যাসাল স্প্রে ভালো কাজ করলেও ৩-৫ দিন একনাগাড়ে ব্যবহার করলে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে]; (৮) নাক বন্ধ অবস্থায় উড়োজাহাজে না চড়াই ভালো; এবং (৯) মাথা নিচু করে শরীর বাঁকানো অনুচিত।

**ওষুধ প্রয়োগ :** অ্যাকিউট সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় ওষুধের দরকার হয় না। তবে প্রয়োজনে দুসপ্তাহের চিকিৎসা চলতে পারে। ক্রনিক সাইনুসাইটিসের চিকিৎসা চলে ৩-৪ সপ্তাহ। ছত্রাকজনিত সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় বিশেষ ধরনের ওষুধ ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিবায়োটিকসহ সমস্ত ওষুধ ব্যবহারে চিকিৎসকের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী হতে হবে।

কোনো শিশু যদি নাক দিয়ে তরল-নির্গমনসহ ২-৩ সপ্তাহ ধরে কাশিতে, ১০২.২° F জ্বরে, মাথাব্যথা ও প্রচন্ড চোখফোলা অসুখে ভোগে তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ শুরু করতে হবে।

## ওটিটিস মিডিয়া (Otitis media) — মধ্যকর্ণের সংক্রমণ

কানের ভিতরে বা বাইরে যে কোন অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটিটিস** (otitis) বলে। কানের মধ্যকর্ণে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলা হয় **ওটিটিস মিডিয়া** (otitis media/middle ear infection)। গলবিলের সাথে মধ্যকর্ণের সংযোগ স্থাপনকারী **ইউস্টেশিয়ান নালি** (eustachian tube) টি অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে, শুধু ঢোকগেলার সময় খোলা থাকে। কোনো কারণে কোনো জীবাণু এ নালি দিয়ে এসে মধ্যকর্ণে প্রদাহ সৃষ্টি করলে তাকে **ওটিটিস মিডিয়া** বলে। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা এরোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

শিশুদের ওটিটিস মিডিয়া তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথা–

১. **স্বল্পস্থায়ী** বা **অ্যাকিউট ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে ইউস্টেশিয়ান নালির প্রতিবন্ধকতার কারণে ঊর্ধ্ব শ্বাসনালি আক্রান্ত হয় এবং মধ্যকর্ণ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ নিরাময় হয়।

২. **দীর্ঘস্থায়ী** বা **ক্রনিক ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রোগ নিরাময় হয় না। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই রোগে কানের পর্দা ফুটো হয় ফলে পুঁজ বা তরল পদার্থ বের হয়ে আসে। শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে।

৩. **অ্যাডহেসিভ ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে কানের পর্দা মধ্যকর্ণের কোনো স্থানে বা অস্থির সাথে আটকে যায়। ফলে রোগী বধির হয়ে যায়।

**রোগের কারণ**

১. প্রধানত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়। Respiratory syncytial virus (RSV), Influenza virus, Rhinovirus এবং *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Monaxella catarrhalis* ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে।
২. মধ্যকর্ণের সাথে নাকের সংযোগস্থল (eustachian tube) ফুলে বন্ধ হয়ে গেলে।
৩. কোন কারণে অ্যাডিনয়েড (adenoids) ফুলে গেলে।
৪. মাতৃদুগ্ধ পান না করালে বা কম করালে।
৫. শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে ঠান্ডা লাগলে এবং কানের সংক্রমণ হলে।

চিত্র ৫.১২ : মধ্যকর্ণ

## ওটিটিস মিডিয়া কাদের বেশি হয়

যাদের ওটিটিস মিডিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে তারা হলো–

১. চার মাস থেকে চার বছর বয়সী শিশুদের।
২. ডে কেয়ার সেন্টারগুলোর মতো জায়গাতে যেখানে একসাথে অনেক শিশু বেড়ে উঠে সেসব শিশুদের।
৩. যেসব শিশুদের নিচু অবস্থানে শুয়িয়ে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয়।
৪. যেসব শিশুরা ধুমপানযুক্ত ও বায়ু দূষণপূর্ণ এলাকায় বাস করে।
৫. পরিবারের অন্য কারো কানে সংক্রমণ হলে শিশুদেরও কানের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

**রোগের লক্ষণ**

**শিশুদের ক্ষেত্রে :**

১. কানে ব্যথা হয় এবং কান টানতে থাকে।
২. মাথা ব্যথা হয় ফলে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে।
৩. দেহে বেশি তাপসহ (১০৪°F+) জ্বর থাকে তাই ঘুমাতে পারে না।
৪. নাক দিয়ে পানি ঝরে, কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হয়।

**বয়স্কদের ক্ষেত্রে :**

১. কানে ব্যথা হয়, কানে চাপ অনুভূত হয় এবং কান ভোঁ ভোঁ করে।
২. মাথা ঝিম ঝিম করা এবং প্রচন্ড মাথা ব্যথা।
৩. কাশি হয় ও নাক দিয়ে পানি ঝরে।
৪. কানে কম শোনে, খাবারে রুচি থাকে না।

## ওটিটিস মিডিয়ার জটিলতা

১. কানের পর্দা বা টিমপ্যানিক পর্দা ছিদ্র হয়।
২. ছিদ্রপথে মধ্যকর্ণ থেকে গাঢ় তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ে।
৩. কানে কম শোনে।
৪. কানে কম শোনার কারণে শিশুরা সহজে কথা বলা শিখতে পারেনা।

**প্রতিরোধ** (Prevention)

১. শিশুর আশেপাশে ধুমপান না করা। কারণ ধুমপায়ীদের শিশু সন্তান ঠান্ডা ও কানের সংক্রমণে বেশি ভুগে থাকে
২. কানের সংক্রমণ প্রতিরোধে জন্মের পর শিশুকে অন্তত প্রথম ছয়মাস বুকের দুধ খেতে দেওয়া। বুকের দু রয়েছে রোগ প্রতিরোধক উপাদান। তা ছাড়া ধারণা করা হয় মায়ের দুধে এমন কোনো উপাদান রয়েছে যা শ করার সময় গলার উপর দিকের মিউকাস পর্দা বা ঝিল্লিতে আটকে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে নিচের দি পাকস্থলিতে নিয়ে আসে। ফলে ব্যাকটেরিয়া উপর দিকে ইউস্টেশিয়ান নালিতে প্রবেশের সুযোগ পায় না।
৩. বুকের দুধ বা অন্য কোনো তরল খাওয়ানোর সময় শিশুর মাথাটি পিঠের সংগে ৪৫ ডিগ্রি কোণে উঁচুতে রা হবে। তা না হলে তরল খাবার ইউস্টেশিয়ান নালি হয়ে কানে ঢুকে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।
৪. অ্যালার্জিজনিত প্রভাব এড়িয়ে চলা। কারণ অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার কারণে ইউস্টোশিয়ান নালি বন্ধ সংক্রমণ ঘটতে পারে।
৫. গোসলের সময় কানে যাতে পানি প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখা; বায়ু দূষণ থেকে দূরে থাকা।
৬. বার বার সর্দি হতে থাকলে এবং নাকের ছিদ্রপথ লালাভ রং এর হলে; শিশু মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে এবং হাঁ করে ঘুমালে শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।
৭. শিশুকালে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাক্সিন গ্রহণ করে (Pneumococcal conjugate vacci *Streptococcus pneumoniae* সৃষ্ট ওটিটিস মিডিয়া রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পা

**প্রতিকার** (Remedy)

১. চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সম্পূর্ণকোর্সের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বা ব্যবহার করা। প্রয়োজনে কানের এবং অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
২. মধ্যকর্ণের প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে না এলে অল্প সময়ের জন্য ব্যথানাশক কোন ঔষধ যেমন– প্যারাসিটামল জা ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. সতর্কতার সংগে ২/৩ ফোঁটা উষ্ণ মিনারেল অয়েল কানে দেওয়া যেতে পারে।
৪. সহনীয় মাত্রায় গরম পানির বোতল চেপে ধরে কানে গরম সেঁক দেওয়া। বেশি গরম হলে কাপড়ে বা টাওয়ে পেঁচিয়ে সেঁক দেওয়া যেতে পারে।
৫. কান দিয়ে সবসময় পুঁজ পড়ার মতো অবস্থা বার বার ঘটলে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ (ENT Specialis চিকিৎসকের মাধ্যমে টিম্প্যানোস্টোমি টিউব (Tympanostomy tube) নামে বিশেষ নলের সাহায্যে আর্দ্র চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

## ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রের তুলনা
## (Comparison Between the X-Ray Film of the Lungs of Smoker and Nonsmoker)

একটি সিগারেটের শলায় প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক থাকে। ধূমপানের ফলে এগুলো দেহের ভেতরে, বি করে ফুসফুসে প্রবেশ করে দেহকে অসুস্থ করা শুরু করে। সিগারেটে যে রাসায়নিক থাকে তার মধ্যে নিকো আর্সেনিক, মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি প্রধান। একজন অধূমপায়ী যে কা চটজলদি করতে পারে, সে কাজ ধূমপায়ীর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ প্রমাণিত হয়। নিচে ধূমপায়ী অধূমপায়ী মানুষের এক্স-রের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

১. **এক্স-রে ফিল্ম :** ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এটি কোথাও কোথাও সাদাটে বা সাদা, অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে এটি কা
২. **ফুসফুস :** এক্স-রে দেখে চিকিৎসক ধূমপায়ী ব্যক্তির ফুসফুসে **পানি জমা** (pleural effusion) শনাক্ত ক পারবেন। এ ধরনের কিছু অধুমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে থাকবে না।
৩. **অ্যালভিওলাই :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না, অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়। তাছাড়া ধূমপায়ীদের ফুসফুসে অধূমপায়ীর চেয়ে কম সং অ্যালভিওলাই দেখা যায়। কারণ ধূমপানের ফলে অ্যালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায়, কালচে বর্ণ ধারণ করে, কর্ম এগুলোর পূর্ণজন্ম হয় না।

৪. **সিলিয়া :** ফুসফুসের অন্ত:প্রাচীর জুড়ে চুলের মতো **সিলিয়া** (cilia) থাকে। ধূমপায়ীদের সিলিয়া অবশ হয়ে পড়ে, ফলে ধূলি ও কণা ভেতরে জমা হয়। অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে এটি ঘটে না তাই ফুসফুস ধূলি-কণা মুক্ত থাকে। এক্স-রে তে এটিও ধরা পড়ে।

৫. **প্রাচীর :** এক্স-রে ফিল্মে ধূমপায়ীর ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর পাতলা ও দুর্বল দেখায়। কিন্তু অধূমপায়ীর এদুটি অংশের প্রাচীর স্বাভাবিক পুরু এবং সবল।

চিত্র ৫.১৩ : ফুসফুসের এক্স-রের তুলনা (বামে-অধূমপায়ী ও ডানে-ধূমপায়ীর ফুসফুসের এক্স-রে)

৬. **এমফাইসোমা :** সিগারেটের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে অ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে গিয়ে ফুসফুসে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি করে। এগুলোকে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে। ধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায় যা অধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে অনুপস্থিত।

৭. **ব্রঙ্কিওল :** ধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে ব্রঙ্কিওলের মিউকাস গ্রন্থিগুলোতে বর্ধিত স্ফীতি দেখা যায়। অধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে গ্রন্থিগুলোর গঠন স্বাভাবিক দেখায়।

৮. **টিউমার :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার উপবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় যা অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৯. **ক্যান্সার কোষ :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় অর্থাৎ কোথাও কোথাও সাদা ঘন জায়গা পরিলক্ষিত হয়। অধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে সাধারণত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোনো ধরনের কোষের চিহ্ন দেখা যায় না।

## কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Artificial Respiration)

কোনো কারণে কারও শ্বসন বন্ধ হয়ে গেলে এমন জরুরী পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তির মুখ বা নাক দিয়ে যান্ত্রিক বা কায়িক সময় প্রক্রিয়ায় বাতাস অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে বা বের করে দিয়ে পুনরায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে সক্ষম করে লে চুক্তভোগি ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলাই হচ্ছে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য। বিপদ-আপদ বলে কয়ে আসে না, তাই ছু প্রাথমিক চিকিৎসা সবারই জেনে রাখা ভাল। কোনো দুঃসময় বা দুর্গমস্থানে কারও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স বা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলেও আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা অসাধ্য হতে পারে। কিন্তু ঐ ময় যদি সঙ্গী-সাথি কারও কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জানা থাকে তাহলে খুব কম সময়ের মধ্যে সে কটি অমূল্য প্রাণ রক্ষা করতে পারে। তবে এ কাজটি করতে হবে একজন প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে এবং কাজ শুরুর আগে উকে বলে রাখতে হবে ডাক্তার বা অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিয়ে রাখতে। এভাবে, জীবন রক্ষায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সেবে মুখ থেকে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

### মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Mouth to Mouth Artificial Respiration)

সময়মত সাহায্য পেলে কিভাবে একটি জীবন বেঁচে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম সপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ। পানিতে ডুবে, কোনো কারণে অক্সিজেনের অভাব, বৈদ্যুতিক শক, বিষপান বা গ্যাস গ্রহণ কৃতি নানা কারণে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে কারণেই হোক শিশু বা কিশোরকে (কিংবা পূর্ণবয়স্ককে) বাঁচাতে াপদ জায়গায় নিয়ে দ্রুত মুখ থেকে মুখে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।